Vol. 60 | No. 1-2 | 2025

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

আদর্শ মানবজীবন গঠনে চাণক্যের অনুশাসন

Volume	60
Issue	1-2
Year	2025
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Malabika Biswas, Mayna Talukdar
Published online	August 20, 2025
DOI	10.62328/sp.v60i1-2.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v60i1-2.2
Pages	23-33
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ

সাহিত্য পত্রিকা

Journal.bangla.du.ac.bd
Print ISSN: 0558-1583
Online ISSN: 3006-886X
বর্ষ: ৬০ সংখ্যা: ১-২
ফাল্গুন ১৪৩১॥ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
প্রকাশকাল: আগস্ট ২০২৫
Issue DOI: 10.62328/sp.v60i1-2

DOI: 10.62328/sp.v60i1-2.2
প্রবন্ধ জমাদান: ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
প্রবন্ধ গৃহীত: ১৫ মে ২০২৫
পৃষ্ঠা: ২৩-৩৩

আদর্শ মানবজীবন গঠনে চাণক্যের অনুশাসন

মালবিকা বিশ্বাস
অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল: mbbiswas65@yahoo.com

ময়না তালুকদার
অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল: drmaynatd@du.ac.bd

সারসংক্ষেপ

চাণক্য ছিলেন নানাবিধ প্রতিভায় ঋদ্ধ এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। আত্মবিশ্বাস আর দৃঢ় মনোবলের কারণেই তিনি জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। চাণক্য-রচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে অর্থশাস্ত্র এবং নীতিশাস্ত্রই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। আনুমানিক ছয় হাজার শ্লোক সমন্বিত তাঁর নীতিশাস্ত্র গ্রন্থটি বিভিন্ন নামে পরিচিত। রাষ্ট্র, সমাজ এবং বিষয়-বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ সমাজস্থ মানুষের অনুশাসনমূলক বাক্যই তাঁর নীতিশাস্ত্রের মূল বক্তব্য। এই অনুশাসনমূলক বাক্যগুলো তিনি তাঁর সমসাময়িক সমাজজীবনের আলোকেই উপস্থাপন করেছেন—যা আদর্শ মানবজীবন গঠনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ, মানুষকে একটি আদর্শ জীবন গঠনে সমাজজীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলার জন্য যে সব চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা অর্জন করতে হয়, যে সব আনুষঙ্গিক ব্যবহার বিচার-বিশ্লেষণ করতে হয়—সে সবই চাণক্য তাঁর নীতিশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করেছেন। একটি আদর্শ মানবজীবন ও আদর্শ সমাজব্যবস্থা গঠনই ছিল চাণক্যের মূল উদ্দেশ্য। সুতরাং, একটি আদর্শ মানবজীবন গঠনে চাণক্যের নীতিশাস্ত্রের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আদর্শ মানবজীবন গঠনে চাণক্যের অনুশাসন প্রতিপন্ন করাই বর্তমান প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য।

মূলশব্দ

নীতিশাস্ত্র, আদর্শ মানবজীবন, অনুশাসন, সুশৃঙ্খল সমাজব্যবস্থা, বিদ্যার গুরুত্ব, মানবকল্যাণ, প্রকৃত বন্ধু, ধন-সম্পত্তি।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি একটি জাতির সভ্যতা ও সমৃদ্ধির চাবিকাঠি। খ্রিষ্টপূর্বাব্দ সময়কাল থেকেই ভারতীয় সভ্যতায় সৃজনশীল যুগ সূচিত হয়। সেই ধারাবাহিকতায় রচিত হয়েছে বেদ, বেদান্ত, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদের মতো গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এ ছাড়াও রচিত হয়েছে মানবজীবন সংশ্লিষ্ট মহাকাব্য, কালজয়ী নাটক, নবযুগের সূচনাকারী অর্থশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র এবং মানববিদ্যা সম্পর্কিত নানা শাস্ত্র। এসব গ্রন্থ দেশ-কালের সীমা অতিক্রম করে সর্ব কালের, সর্ব যুগের সর্ব মানুষের মনকে করেছে আলোকিত এবং উজ্জীবিত। আর এই আলোকরশ্মি আজও মানুষকে করছে অনুপ্রাণিত।

ভারতীয় ইতিহাসে চাণক্য ছিলেন বহুগুণে ঋদ্ধ এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন প্লেটো এবং এরিস্টটলের মতো রাজধর্মের পথিকৃৎ, এডাম স্মিথের মতো অর্থনৈতিক দর্শনের প্রবক্তা এবং মার্কসের মতো একজন সামাজিক দার্শনিক। চাণক্য ভারতের ইতিহাসে একজন ঋষিসদৃশ ব্যক্তি হিসেবে খ্যাত ছিলেন। তিনি প্রাচীন ভারতীয় অর্থনীতিবিদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, দার্শনিক ও রাজ-উপদেষ্টা হিসেবে ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এজন্য তাঁকে ভারতের মেকিয়াভেলি বলা হয়। চাণক্য আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় থেকে চতুর্থ শতকে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর জন্মস্থান অবিভক্ত ভারতের তক্ষশীলা (বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত)। তিনি ছিলেন এক উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। চাণক্যের জীবনী নিয়ে বিভিন্ন গল্প-উপাখ্যান রয়েছে। বহু বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ় প্রত্যয়ে তিনি জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। এক্ষেত্রে তাঁর দৃঢ় মনোবলই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। নীতিশাস্ত্রকার কামন্দক তাঁর নিজ গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে চাণক্য সম্পর্কে বলেন:

বংশে বিশালবংশানামৃষীণামিব ভূয়সাম্।
অপ্রতিগ্রাহকাণাং যো বভূব ভুবি বিশ্রুতঃ॥
জাতবেদা ইবার্চিচষ্মান্ বেদান্ বেদবদ্যাং বরঃ।
যোঽধীতবান্ সুচতুরশ্চতুরঽপ্যেকবেদবৎ
যস্যাভিচারব্রজেন বজ্রজ্বলনতেজসঃ।
পপাতামূলতঃ শ্রীমান্ সুপর্বা নন্দপর্বতঃ
একাকী মন্ত্রশক্ত্যা সঃ শক্ত্যা শক্তিধরোপমঃ।
আজহার নৃচন্দ্রায় চন্দ্রগুপ্তায় মেদিনীম্
নীতিশাস্ত্রামৃতং ধীমানর্থশাস্ত্রমহোদধেঃ।
সমুদ্দধ্রে নমস্তস্মৈ বিষ্ণুগুপ্তায় বেধসে (শ্লোক নং ২-৬) (টি গণপতি ১৯১২: ২-৪)

অর্থাৎ, যিনি ঋষিপ্রতিম প্রতিগ্রহ-পরাঙ্মুখ মহীয়ান পূর্বপুরুষগণের বিরাট বংশে জন্মগ্রহণ করে জ্ঞানের আলোতে সম্পূর্ণ জগৎকে উদ্ভাসিত করেছেন, যিনি নিজে অগ্নির ন্যায় তেজস্বী, যিনি স্বীয় প্রতিভার দ্বারা এবং নিষ্ঠাযুক্ত অধ্যবসায়ের মাধ্যমে অতি আয়াসে চারটি বেদ অধ্যয়ন করে বেদজ্ঞ-ব্রাহ্মণদের মধ্যে অগ্রে স্থান পেয়েছেন, যিনি মনীষামণ্ডিত মহাপুরুষের অভিচার বজ্র দিয়ে পাপে নিমজ্জিত নন্দভূপাল মহীপালকে সমূলে ধ্বংস করেছেন, যিনি নিজে অত্যন্ত শক্তিমান কার্তিকেয়ের মতো মহাশক্তিশালী হয়ে উঠেছেন, যিনি একমাত্র মহীয়সী মন্ত্রশক্তির দ্বারা বলশালী হয়ে মানবাকাশের চন্দ্ররূপ চন্দ্রগুপ্তকে মগধের সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন, যিনি স্বীয় জ্ঞানরশ্মির আলোকে অর্থ-শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করে

নীতিশাস্ত্রের অমৃত পান করেছেন—আমার সেই মহান গুরুদেব চাণক্যের চরণে আমি শ্রদ্ধাভরে নমস্কার করি।

চাণক্যের গ্রন্থাবলির মধ্যে অর্থশাস্ত্র এবং নীতিশাস্ত্রই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। এ ছাড়াও তাঁর রচিত ন্যায়ভাষ্য নামে কামসূত্র এবং ন্যায়সূত্রের ভাষ্যগ্রন্থও উল্লেখযোগ্য। চাণক্য-গবেষকগণ কর্তৃক চাণক্যের নীতিশাস্ত্র বিভিন্ন নামে উল্লেখিত হয়েছে, যেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য *চাণক্যনীতিদর্পণ, চাণক্য শ্লোক, চাণক্য-শতক, চাণক্য-নীতি, চাণক্য-নীতি-শতক, চাণক্য-সূত্রম্, চাণক্য-নীতিশাস্ত্র, চাণক্য-সুভাষিত-শ্লোক-সংগ্রহ, বৃদ্ধচাণক্য, লঘুচাণক্য, বোধিচাণক্য, চাণক্য সার-সংগ্রহ* ইত্যাদি। এই *নীতিশাস্ত্র* গ্রন্থটি ছিল আনুমানিক ছয় হাজার শ্লোকসম্বলিত। এ প্রসঙ্গে S. K. De-এর উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য:

> ... there can be no doubt that both in its thought and expression, it is one of the richest and finest collections of gnomic stanzas in sanskrit, many of which must have been derived from fairly old sources. (1947: 196)

চাণক্যের নীতিশাস্ত্রের সারবস্তু হলো: রাষ্ট্র, সমাজ এবং বিষয়-বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ সমাজস্থ মানুষের অনুশাসনমূলক বাক্য। এই অনুশাসনমূলক বাক্য তিনি তাঁর সমসাময়িক সমাজজীবনের আলোকেই আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। মানুষকে সংসারে চলার পথে অগণিত শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। কিছু কিছু শিক্ষা এমন গুরুত্বপূর্ণ যেগুলো গ্রহণ না করলে আদর্শ মানবচরিত্র গঠন তো সম্ভবই হয় না, তদুপরি জীবনের চলার গতি ব্যাহত হয়। জীবনে এ গতিকে সচল করার মানসেই মহাজ্ঞানী চাণক্য তা শ্লোকের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। মানুষকে একটি আদর্শ জীবন গঠনে সমাজজীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলার জন্য যে সব চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা অর্জন করতে হয়, যে সব আনুষঙ্গিক ব্যবহার বিচার-বিশ্লেষণ করতে হয়, সে সবই চাণক্য তাঁর নীতিশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করেছেন। এ প্রসঙ্গে একজন চাণক্য-গবেষকের উক্তি: 'চাণক্যের শ্লোক ও সূত্রের মাঝে রয়েছে মানব জীবনের নানামুখী শিক্ষা ও ব্যক্তি জীবনকে পরিচালিত করার ব্যবহারিক জ্ঞান। যে জ্ঞানের ব্যাপ্তি প্রত্যেকের জীবনে আলোর দ্যুতি ছড়িয়ে মূল লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করে।' (মোস্তাক ২০১৩: ৭)

এ ছাড়া অন্য একটি গ্রন্থে বলা হয়েছে:

> চাণক্যের নীতিশাস্ত্রে যেমন সদর্থকমূলক অনুশাসন বাক্যের উল্লেখ রয়েছে, তেমনি নেতিবাচকমূলক অনুশাসন বাক্যেরও উল্লেখ রয়েছে। তাঁর সদর্থকমূলক অনুশাসন বাক্য এবং নেতিবাচকমূলক অনুশাসন বাক্য উভয় ক্ষেত্রেই সু-মানব-জীবন গড়ার ইঙ্গিত রয়েছে। তৎকালীন সমাজজীবনের প্রেক্ষাপটের আলোকেই তিনি এরূপ অনুশাসনমূলক বাক্য আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। চাণক্যের লক্ষ্য ছিল কণ্টকাকীর্ণ মানবজীবন ও মানবসমাজের পরিবর্তে একটি আদর্শ মানব ও আদর্শ-সমাজব্যবস্থা গঠন। (মালবিকা ও ময়না ২০২৩: ৮)

সুতরাং এ কথা বলা যায় যে, একটি আদর্শ মানবজীবন গঠনে চাণক্যের নীতিশাস্ত্রের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আর আদর্শ মানবজীবন গঠনে চাণক্যের অনুশাসন প্রতিপন্ন করাই বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য।

চাণক্যের নীতিশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়গুলো প্রধানত:

> বিদ্বজ্জনের প্রশংসা, অবিদ্বানের নিন্দা, প্রাজ্ঞ-বিজ্ঞ ব্যক্তির গুণাবলি ও প্রশংসা, প্রকৃত বন্ধুর গুণাবলি, অপ্রকৃত বন্ধু সম্পর্কে নির্দেশ, দুর্জনের নিন্দা, সজ্জনের প্রশংসা, স্ত্রীজাতি সম্পর্কে মন্তব্য, মানবেতর প্রাণী থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা ও তাদের প্রতি কর্তব্য, বিপদ-আপদ থেকে রক্ষার উপায়, কর্তব্যাকর্তব্য সম্পর্কে নির্দেশ, জীবন পরিচালনায় অর্থের প্রয়োজনীয়তা, সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার কর্তব্য এবং পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য, উত্তম কাজ করার নির্দেশ, সুখ-দুঃখ নির্ণয় ইত্যাদি। (মালবিকা ও ময়না ২০২৩: ৮)

উপর্যুক্ত বিষয়গুলোর প্রায় সব কটিরই মর্মার্থ আদর্শ মানবজীবন গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। আর এই বার্তাই আলোচ্য প্রবন্ধে তুলে ধরতে প্রয়াসী হব।

মানুষের জীবনের নানাবিধ সম্পদের মধ্যে বিদ্যার স্থান সর্বাগ্রে। যিনি বিদ্যা অর্জন করেন—তিনিই বিদ্বান। বিদ্যা অর্জনের মাধ্যমে একজন মানুষ অগাধ জ্ঞানের অধিকারী হতে পারেন। এই জ্ঞান পারে মানুষকে সু-মানব হিসেবে গড়তে। যথার্থ বিদ্যাশিক্ষার মাধ্যমে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করে মানুষ নিজেকে দৃঢ়চেতা, আত্মবিশ্বাসী, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও প্রাজ্ঞ করে গড়ে তুলতে পারেন। তাই আদর্শ মানবজীবন গঠনে বিদ্যার গুরুত্ব অপরিসীম। চাণক্যের মতে, রাজা একটি রাজ্যের অধিপতি হওয়া সত্ত্বেও একজন বিদ্বান ব্যক্তির সমতুল্য হন না। কেননা, রাজা তাঁর আধিপত্যের কারণে নিজের দেশে যে সম্মান পান, অন্য দেশে সেই সম্মান নাও পেতে পারেন। কিন্তু বিদ্বানের সম্মান নিজের দেশের গণ্ডীতেই সীমাবদ্ধ থাকে না। তিনি যে দেশেই যান না কেন, সে দেশেই অফুরন্ত সম্মান ও মর্যাদা পেয়ে থাকেন:

> বিদ্বত্ত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচন।
> স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্বত্র পূজ্যতে॥ (পৃথ্বীরাজ ২০২২: ৯)

বিদ্বানের সম্মান ও মর্যাদা সর্বত্র আছে বলেই আজও মানুষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, মধুদূদন দত্ত, আইজ্যাক নিউটন, শেলী, কীটস, বায়রন প্রমুখ বিদ্বানগণকে। এসব মনীষীর চর্চিত জ্ঞান ও জীবনালেখ্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে মানুষ স্বীয় জীবনকে আলোকিত করতে উৎসাহিত হয়। বিদ্যার গুরুত্ব সম্পর্কে চাণক্য আরো বলেন:

> পণ্ডিতে চ গুণাঃ সর্বে মূর্খে দোষা হি কেবলম্।
> তস্মান্মূর্খ সহস্রেভ্যঃ প্রাজ্ঞ একো বিশিষ্যতে॥ (পৃথ্বীরাজ ২০২২: ১০)

অর্থাৎ, জ্ঞানী ব্যক্তি সকল গুণের, আর মূর্খ ব্যক্তি সকল দোষের আশ্রয়স্থল। অতএব হাজার মূর্খ অপেক্ষা একজন জ্ঞানী অধিক শ্রেয়।

জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁর অধীত বিদ্যার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করে ব্যবহারিক জীবনে বিচারবুদ্ধি প্রয়োগে সমর্থ হন। ফলে দৈনন্দিন জীবনে নানাবিধ ভুল-ভ্রান্তি থেকে তিনি দূরে থাকতে পারেন। অপর দিকে, মূর্খ ব্যক্তি অজ্ঞতার কারণে নিজের জীবনের তো উন্নতি করতে পারেই না, তদুপরি পরিবারের ও সমাজের কাছে অপমানিত, অপদস্থ হয়। ফলে মূর্খতা মানবজীবনে কুফল বয়ে আনে। তাই বলা যায়, আদর্শ মানবজীবন গঠনে বিদ্যার্জন অনস্বীকার্য।

মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বিদ্যা। তাই মানুষের রূপ-যৌবন-উচ্চবংশ সবই তুচ্ছ হয়ে যায় যদি তিনি বিদ্বান না হন। এক্ষেত্রে চাণক্য গন্ধহীন পলাশ ফুলের উদাহরণ দিয়েছেন। পলাশ ফুলের বর্ণই সর্বস্ব। সেই বর্ণ ম্লান হয়ে গেলে সুবাস না থাকায় তার সমাদর থাকে না। রূপ-যৌবন ক্ষণস্থায়ী। বংশের আভিজাত্যও অর্থহীন হয়ে যায় যদি না সেই বংশের যোগ্য হওয়া যায়। বিদ্যাই মানুষের চিরজীবনের বান্ধব। যথার্থ সম্পদ। বিদ্যাহীন লোক সংকল্পবদ্ধ হতে পারে না। বিশৃঙ্খল জীবনই তার সঙ্গী হয়। তাই তো বিদ্যাহীন ব্যক্তি সমাজে অনাদরে পরিত্যক্ত হয়। সমাজে তার স্থান নগণ্য। চাণক্যের ভাষায়:

রূপযৌবনসম্পন্না বিশালফুলসম্ভবাঃ।
বিদ্যাহীনা ন শোভন্তে নির্গন্ধা ইব কিংশুকাঃ॥ (পৃথ্বীরাজ ২০২২: ১২)

অর্থাৎ, বিদ্যাহীন লোক রূপ-যৌবন-উচ্চবংশসম্পন্ন হলেও গন্ধহীন পলাশ ফুলের ন্যায় অনাদরে পরিত্যক্ত হয়।

চাণক্য তাঁর নীতিশাস্ত্রে জ্ঞানী তথা প্রাজ্ঞজনের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। আমরা জানি, সমাজে বিভিন্ন সামাজিক নিয়মকানুন মেনে বসবাস করতে হয়। যেমন—পরস্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট না হওয়া, পরের জিনিসে লোভ না করা, সকল জীবের সুখ-দুঃখের অনুভূতিকে নিজের মনে করা ইত্যাদি। আর এজন্য প্রয়োজন অসৎ প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় না দিয়ে নিজের ইন্দ্রিয়গুলোকে সংযত রাখা। সকল প্রকার কামনা-বাসনাশূন্য ও আসক্তিহীন হয়ে সর্বজীবের হিতসাধনে নিয়োজিত থাকা এবং সর্বদা মানবকল্যাণে ব্রতী হওয়া। চাণক্যের ভাষায়:

মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।
আত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ॥ (পৃথ্বীরাজ ২০২২: ১০)

অর্থাৎ, যিনি পরের স্ত্রীকে মাতৃজ্ঞানে শ্রদ্ধা করেন, পরের জিনিসকে মাটির ঢেলা মনে করে লোভ করেন না এবং সকল জীবকে নিজের মনে করেন—তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী তথা পণ্ডিত বলে বিবেচিত।

জীবনে চলার পথে মানুষকে পরিবার ছাড়াও সমাজের বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তির সঙ্গে মেলামেশা করতে হয়। এসব মানুষের মধ্যে ভালো-মন্দ দুই-ই থাকে। ভালো মানুষের সংস্পর্শে মানুষের জীবন হয় নিরাপদ, সুখময় ও কণ্টকমুক্ত। এরাই মানুষের প্রকৃত বন্ধু। এদের সঙ্গ মানুষের জীবনকে ভালোভাবে এগিয়ে নিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। তাই বন্ধু নির্বাচনে সতর্ক হতে হবে। একজন প্রকৃত বন্ধুই সৎ বুদ্ধি, সৎ পরামর্শ দিয়ে মানুষকে সৎ পথে চালিত করে। এ সংসারে প্রকৃত বন্ধুর সংখ্যা খুবই নগণ্য। চাণক্যের ভাষায়:

উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে শত্রুবিগ্রহে।
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ॥ (পৃথ্বীরাজ ২০২২: ২২)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আনন্দ অনুষ্ঠানে, বিপদের সময়ে, দুর্ভিক্ষের সময়ে, শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে, বিচারালয়ে এবং শবদাহকালে সর্বদা পাশে থাকেন—তিনিই প্রকৃত বন্ধু।

অনেকে বন্ধুত্বের ভান করে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে স্বার্থসিদ্ধির জন্য মানুষের মন জয় করে। তখন মানুষ সরল বিশ্বাসে তাকে বন্ধু মনে করে। বন্ধুত্বের মুখোশধারী এসব লোক সুযোগ

বুঝে তাদের ক্ষতিসাধন করে। তাই বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রকৃত বন্ধু নির্বাচন করে এসব মুখোশধারী বন্ধুকে সবসময় বর্জন করতে হবে। একটি কলসের উপরে অল্প দুধ এবং ভিতরে তীব্র বিষ থাকলে যেমন প্রথমেই চোখে পড়ে না—এরাও সে ধরনের হয়। এ দুধ পান করলে যেমন মৃত্যু অবধারিত—তেমন এ রকম বন্ধুর সংস্পর্শে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে যায়। এরা প্রকৃত বন্ধু নয়। চাণক্য এ ধরনের বন্ধুকে ত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর ভাষায়:

> পরোক্ষে কার্যহন্তারং প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদিনম্।
> বর্জয়েৎ তাদৃশং মিত্রং বিষকুম্ভং পয়োমুখম্॥ (পৃথ্বীরাজ ২০২২: ২৩)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি সাক্ষাতে ভালো কথা বলে অসাক্ষাতে অনিষ্ট সাধন করে, সে রকম মুখে মধু, কিন্তু অন্তরে বিষ বন্ধুকে বর্জন করা উচিত।

কোনো ব্যক্তির জীবনে এসব বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন নিঃসন্দেহে আদর্শজীবন গঠনে সহায়ক হবে।

সমাজে বিভিন্ন রকম লোক বাস করে। এদের সকলের মানসিকতা সমান নয়। এদের মধ্যে যেমন সৎ মানসিকতার মানুষ রয়েছে, তেমনি অসৎ মানসিকতার লোকেরও অভাব নেই। অর্থাৎ, সমাজে রয়েছে দুই শ্রেণির লোকের বাস: সজ্জন ও দুর্জন। সজ্জনেরা মঙ্গলকামী, তারা নিজেদের মঙ্গল প্রার্থনার পাশাপাশি অন্যদেরও মঙ্গল প্রার্থনা করে। তারা সকলের বিপদে-আপদে এগিয়ে আসে। সৎ চিন্তা, সৎ বুদ্ধি, মায়া-মমতা, দেশপ্রেম, পরোপকার, সহমর্মিতা ইত্যাদি মানবিক গুণাবলি তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। অপর দিকে, দুর্জন ঠিক এর বিপরীত চরিত্রের হয়ে থাকে। তারা কখনোই অপরের ভালো দেখতে পারে না। অন্যের ক্ষতিসাধনে সদা সচেষ্ট থাকে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দুর্জন ব্যক্তি মিষ্টভাষী হয়; কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য থাকে সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করা। চাণক্যের ভাষায়:

> দুর্জনঃ প্রিয়বাদী চ নৈতদ্বিশ্বাসকারণম্।
> মধু তিষ্ঠতি জিহ্বাগ্রে হৃদয়ে তু হলাহলম্॥ (পৃথ্বীরাজ ২০২২: ২৮)

অর্থাৎ, দুর্জন লোক প্রিয়কথা বললেও তা বিশ্বাস করতে নেই। কারণ, তার মুখে মধু, অন্তরে তীব্র বিষ।

চাণক্য তাঁর নীতিশাস্ত্রে এসব দুর্জনদের পরিত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছেন:

> দুর্জনঃ পরিহর্তব্যো বিদ্যয়ালঙ্কৃতোঽপিসন্।
> মণিনা ভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ॥ (পৃথ্বীরাজ ২০২২: ২৯)

অর্থাৎ, দুর্জন বিদ্যায় ভূষিত হলেও তাকে পরিত্যাগ করা উচিত। কেননা, মণি দ্বারা ভূষিত সর্প চিরদিন ভয়ংকরই থাকে।

তাই চাণক্য দুর্জন সঙ্গ ত্যাগ করে সজ্জন সঙ্গের অভিলাষ করতে বলেছেন:

> ত্যজ দুর্জনসংসর্গং ভজ সাধুসমাগমম্।

কুরু পুণ্যমহোরাত্রং স্মর নিত্যমনিত্যম্॥ (পৃথ্বীরাজ ২০২২: ৩৫৩)

অর্থাৎ, দুর্জনের সংসর্গ পরিত্যাগ করো, সজ্জনের সঙ্গ ভজনা করো। দিবারাত্রি পুণ্য কর্ম করো। সবসময় নিত্য-অনিত্য স্মরণ করো।

অতএব আমাদের উচিত সর্বদা দুর্জন ব্যক্তি হতে দূরে থেকে সজ্জন সংসর্গে বসবাস করা। এজন্য আমাদের সাধু সঙ্গের অভিলাষ এবং দুর্জন সঙ্গ বর্জনের অভিপ্রায় ধারণ করতে হবে। চাণক্য কর্তৃক নির্দেশিত এসব নীতিবাক্য একজন ব্যক্তিকে তার আদর্শ জীবন গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রদানে সহায়তা করে।

এই পৃথিবীতে কেবল মানবসন্তান বাস করে না, মানুষের পাশাপাশি বিভিন্ন জীবজন্তু, পশুপাখিরও বাস রয়েছে। এসব ইতর প্রাণী থেকে মানুষ কম-বেশি বিভিন্ন ধরনের উপকার পেয়ে থাকে। আবার কখনো কখনো এরা মানুষের অপকারও করে। তবে উপকার বা অপকার যাই হোক না কেন, কোনো কোনো প্রাণী থেকে বেশ কিছু শিক্ষা অর্জন করা যায়। এগুলো মানবজীবনে প্রয়োগ করলে একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ আদর্শ জীবন গঠন সম্ভব হয়। চাণক্য তাঁর *নীতিশাস্ত্রে* এসব শিক্ষা গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এগুলো হলো: পশুরাজ সিংহের মতো যে কোনো কাজ অগ্র-পশ্চাৎ চিন্তা করে যত্নসহকারে করা; বকের মতো স্থান-কাল-পাত্র বিচার-বিবেচনা করে সকল ইন্দ্রিয়কে সংযত রেখে সুযোগ বুঝে কর্ম করা; কুকুরের মতো প্রভুভক্ত হওয়া, সাহসী হওয়া, খাদ্য গ্রহণে সমর্থ হওয়া, অল্পে তুষ্ট হওয়া, সুনিদ্রা যাওয়া, তাড়াতাড়ি জেগে ওঠা ইত্যাদি; গাধার মতো অবিরাম ভার বহন করা, শীত বা গরমে কষ্ট বোধ না করা এবং সবসময় সন্তুষ্ট থাকা; কাকের মতো সংগম গোপনে করা, সময় মতো সঞ্চয় করা, অপ্রমত্ততা ও সমভাব প্রদর্শন করা; এবং মোরগের মতো প্রভাতে ঘুম থেকে ওঠা, যুদ্ধে পরাক্রম প্রদর্শন, বন্ধুদের সঙ্গে আহার গ্রহণ, বিপদাপন্ন নারীকে রক্ষার নিমিত্তে প্রাণপণ চেষ্টা করা ইত্যাদি। জীবনের প্রয়োজনে এসব শিক্ষা মানুষের অর্জন করা উচিত। তাই তো চাণক্য বলেন:

সিংহাদেকং বকাদেকং শিক্ষেত চত্বারি কুক্কুটাৎ।
বায়সাৎ পঞ্চ শিক্ষেচ্চ ষট্ শুনস্ত্রীণি গর্দভাৎ॥ (মালবিকা ও ময়না ২০২৩: ৪৮)

অর্থাৎ, সিংহ হতে একটি; বক হতে একটি; মোরগ হতে চারটি; কাক হতে পাঁচটি; কুকুর হতে ছয়টি এবং গাধার নিকট হতে তিনটি বিষয় শিক্ষণীয়।

মানবজীবনে এসব ইতর প্রাণী থেকে শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আছে বলেই এদেরকে ভালোভাবে যত্নসহকারে পালন করা অত্যন্ত জরুরি। এ বিষয়েও চাণক্যের নির্দেশ লক্ষ করা যায়।

জীবনে চলার পথে অর্থের গুরুত্ব অপরিসীম। অর্থ ব্যতীত জীবন অচল। পার্থিব সকল সুখের মূল অর্থ। বিত্তবানের ক্ষমতা অসীম। শত দোষ করেও তার কোনো শাস্তি হয় না। অনেক ক্ষেত্রে অর্থের মাধ্যমে সে পার পেয়ে যায়। সম্পদের প্রভাবে সে যে কোনো কাজ করতে সাহস দেখায়। অপর দিকে, অর্থহীন ব্যক্তিকে তার স্ত্রী, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজন সকলের নিকট ছোট হয়ে থাকতে হয়। দারিদ্র্যক্লিষ্ট হয়েই তাকে জীবনধারণ করতে হয়। সে প্রায়ই

সকলের করুণার পাত্র হয়। কোনো কিছু করতে চাইলেও সে করতে পারে না। যার সম্পদের প্রাচুর্য আছে, সে গুরুতর অপরাধ করলেও লোকে তাকে সম্মান করে। অন্যদিকে বিত্তহীন লোক চন্দ্রবংশের ন্যায় উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করলেও ধন-সম্পদ না থাকায় কেউ তাকে সম্মান করে না। তাই তো চাণক্য মানবজীবনে অর্থের গুরুত্ব অনুধাবন করে বলেন:

> অবিদ্যাং জীবনং শূন্যং দিকশূন্যা চেদঃবান্ধবা।
> পুত্রহীনং গৃহং শূন্যং সর্বশূন্যা দরিদ্রতা॥ (পৃথ্বীরাজ ২০২২: ৫১)

অর্থাৎ, যার বিদ্যা নেই, তার জীবন শূন্য; যার বন্ধু-বান্ধব নেই, তার দিক শূন্য; যার পুত্র নেই, তার গৃহ শূন্য; আর যে দরিদ্র, তার সবই শূন্য।

তাই সুখ-শান্তি সমৃদ্ধ হয়ে সুস্থভাবে জীবন কাটাতে মানবজীবনে অর্থের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। আর চাণক্যের বক্তব্যেও সেই বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে।

মানবজীবন কণ্টকমুক্ত নয়। জীবন মানেই নানাবিধ সমস্যা। এসব সমস্যা সমাধানকল্পে তাকে পূর্ব থেকে সচেতন হতে হবে। যেমন—সঞ্চিত অর্থের মাধ্যমে দুর্ভিক্ষ, দুর্ঘটনা, মারাত্মক রোগ-ব্যাধি ইত্যাদি থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। এ ছাড়া সাংসারিক সুখ-শান্তি নির্ভর করে স্বামী-স্ত্রীর সুদৃঢ় বন্ধনের উপর। তাই বিপদাপন্ন স্ত্রীকে সর্বস্ব দিয়ে রক্ষা করতে হবে। কিন্তু সবকিছুর ঊর্ধ্বে নিজেকে রক্ষা করা কর্তব্য। কেননা যদি নিজে জীবিতই না থাকা যায়, তাহলে জীবন গঠনের প্রশ্নই ওঠে না। চাণক্যের ভাষায়:

> আপদর্থং ধনং রক্ষেদ্ দারান্ রক্ষেদ্ধনৈরপি।
> আত্মানং সততং রক্ষেদ্ দারৈরপি ধনৈরপি॥ (পৃথ্বীরাজ ২০২২: ৩৪)

অর্থাৎ, বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ধন-সম্পত্তি রক্ষা করবে। স্ত্রী বিপদাপন্ন হলে ধন-সম্পত্তির বিনিময়ে তাকে রক্ষা করবে। আর স্ত্রী অথবা ধন-সম্পত্তির বিনিময়ে হলেও সর্বদা নিজেকে রক্ষা করবে।

এখানে উল্লেখ্য, স্ত্রীর বিনিময়ে হলেও নিজেকে রক্ষা করার কথাটির মাধ্যমে প্রকাশিত নারীজাতির প্রতি চাণক্যের নেতিবাচক মনোভাব তৎকালীন সমাজেরই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন বুঝতে হবে।

পিতা-মাতা, ভাই-বোন, স্ত্রী, সন্তান নিয়েই মানুষের পরিবার গড়ে ওঠে। পরিবারেই সুখের ভিত্তি স্থাপিত হয়। মানবজীবনে পারিবারিক সুখ-শান্তি ব্যতীত কখনোই মানসিক প্রশান্তি আসতে পারে না। একজন সুসন্তানই দিতে পারে মানুষকে এই প্রশান্তি। পরিবার থেকে প্রাপ্ত এই প্রশান্তি মানুষকে একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে গঠিত হতে উদ্বুদ্ধ করে। নিজের সন্তান দ্বারা বংশের মুখ উজ্জ্বল হলে, গৌরব বৃদ্ধি পেলে মানুষ গর্ববোধ করে। কিন্তু সব সন্তানই বংশের মুখ উজ্জ্বল করতে পারে না। সন্তান যদি সুসন্তান হয়, তবে একজন সন্তানই পারে তার বংশের গৌরব বৃদ্ধি করতে—যা বহু মূর্খ সন্তান বা সাধারণ সন্তান দ্বারা সম্ভব হয় না।

এ সম্পর্কে চাণক্য যথার্থই বলেন:

> একেনাপি সুবৃক্ষেণ পুষ্পিতেন সুগন্ধিনা।

বাসিতং স্যাদ্ বনং সর্বং সুপুত্রেণ কুলং যথা॥ (পৃথ্বীরাজ ২০২২: ১৮)

অর্থাৎ, সুগন্ধ পুষ্পের একটি মাত্র বৃক্ষের দ্বারা যেমন সমগ্র বনভূমি সুবাসিত হয়, তেমনি একজন মাত্র সুপুত্রের দ্বারা সমগ্র বংশের মুখ উজ্জ্বল হয়।

বংশকে গৌরবান্বিত করতে যেমন সুপুত্র প্রয়োজন, তেমনি সুপুত্র তৈরি করতেও পিতা-মাতাকে সচেতন হতে হয়। কারণ পরিবার থেকেই শিশু প্রথম শিক্ষা লাভ করে। তাকে আদর, ভালোবাসা যেমন দিতে হবে, তেমনি প্রয়োজনে শাসনও করতে হবে, আবার তার সঙ্গে একান্তে বন্ধুর মতোও আচরণ করতে হবে। একজন সুসন্তান তৈরি করা প্রত্যেক পিতা-মাতারই কর্তব্য এবং এ কর্তব্য তাঁদের দায়িত্ব নিয়েই পালন করতে হবে। চাণক্যের মতে:

লালয়েৎ পঞ্চ বর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ।
প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ॥ (পৃথ্বীরাজ ২০২২: ২৬)

অর্থাৎ, পিতা-মাতা তাঁর সন্তানকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত আদর-স্নেহে প্রতিপালন করবেন, পরবর্তী দশ বছর পর্যন্ত তাকে যথাযথ শাস্তি প্রদান করে শিক্ষা দেবেন, অতঃপর ষোলো বছর বয়স হলে পুত্রের (সন্তানের) সঙ্গে বন্ধুসুলভ আচরণ করবেন।

একজন সুসন্তান যেমন পিতা-মাতার জীবনে সুখ-শান্তি আনয়ন করে, তেমনি তাদের (পিতা-মাতার) জীবনকে আদর্শ জীবনরূপে গঠিত হতেও কার্যকরী ভূমিকা রাখে।

মানুষ সামাজিক জীব। তাই জীবনে চলার পথে তাকে বিভিন্ন নিয়ম-নীতি অনুসরণ করতে হয়। এ ছাড়াও সমাজে রয়েছে প্রচলিত কিছু উপদেশমূলক বাক্য—সেগুলো আদর্শ মানবজীবন গঠনে প্রভূত সহায়তা করে থাকে। চাণক্যের *নীতিশাস্ত্রে* এ বিষয়ে অসংখ্য বাক্যমালার সমাহার পরিলক্ষিত হয়। সেখান থেকে কিছু কিছু বিষয় বর্ণনা করা হলো।

উচ্ছৃঙ্খল জীবন ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করে। তাই সমাজে বাস করতে হলে মানুষকে কিছু সামাজিক বিধি মেনে চলতেই হয়। অন্যথায় নিজের যেমন ক্ষতি হয়, সমাজেরও ক্ষতি হয়। মানুষের কখনো পরের স্ত্রী এবং পরের জিনিসের প্রতি লোভ করা উচিত নয়। পরনিন্দা মহাপাপ। অকারণ পরনিন্দায় যেমন সময় নষ্ট হয়, তেমনি শত্রুতা বাড়ে। তাই পরনিন্দা থেকে বিরত থাকা উচিত। আমরা প্রায়ই মানুষকে উপহাস করে কষ্ট দিয়ে থাকি। ফলে বিবাদের সৃষ্টি হয়। এ ছাড়া কখনোই গুরুজনের নিকট চপলতা প্রকাশ করা উচিত নয়। এতে শিষ্টাচার বহির্ভূত প্রকৃত শিক্ষার অভাব প্রকাশ পায়:

পরদারান্ পরদ্রব্যং পরীবাদং পরস্য চ।
পরিহাসং গুরুস্থানে চাপল্যঞ্চ বিবর্জয়েৎ॥ (পৃথ্বীরাজ ২০২২: ৩৫)

তাই মানুষকে সর্বদা উল্লেখিত বিষয়গুলো থেকে বিরত থাকতে হবে। তবেই মানুষ আদর্শ মানুষ হিসেবে সমাজে স্থান লাভ করতে পারবে।

খাদ্যদ্রব্য আহারের মাধ্যমে মানুষের ক্ষুধা নিবারণ হয়; কিন্তু তাতে আত্মিক ক্ষুধা মেটে না। সেজন্য দরকার সচ্চরিত্র প্রকৃত মিত্রের সৌহার্দ্যপূর্ণ অধ্যয়ন প্রভৃতির মাধ্যমে জগতের নানাবিধ বিষয়ে জ্ঞানার্জন। এ ছাড়া মহান ব্যক্তিদের নিকট সম্মান অমূল্য সম্পদ। পণ্ডিতগণ কখনোই

সম্মানহীন দেশকে স্বীয় বাসস্থান করেন না। কারণ সম্মানহীন দেশ আত্মিকভাবে 'অনুন্নত'। এ ছাড়া যে দেশে বিদ্যা অর্জনের কোনো ব্যবস্থা নেই, সে দেশ অশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকে। ফলে ভবিষ্যত প্রজন্ম শিক্ষা গ্রহণ না করে সমাজের বোঝা হয়ে যায়। সুতরাং, বাসস্থানের জন্য যথার্থ দেশ নির্বাচন করতে অসমর্থ হলে আদর্শ মানবজীবন গঠন সম্ভবপর হবে না। তাই চাণক্য বলেন:

> যস্মিন দেশে ন সম্মানো ন বৃত্তির্ন চ বান্ধবাঃ।
> ন চ বিদ্যাগমঃ কশ্চিৎ তং দেশং পরিবর্জয়েৎ॥ (পৃথ্বীরাজ ২০২২: ৪২)

অর্থাৎ, যে দেশে কোনো সম্মান নেই, জীবিকার কোনো ব্যবস্থা নেই, প্রকৃত বন্ধু নেই, বিদ্যা অর্জনের ব্যবস্থা নেই—সেই দেশ বর্জন করা উচিত।

চাণক্য আরো বলেন:

> কুদেশঞ্চ কুবৃত্তিঞ্চ কুভার্যাং কুনদীন্তথা।
> কুদ্রব্যঞ্চ কুভোজ্যঞ্চ বর্জয়েচ্চ বিচক্ষণঃ॥ (পৃথ্বীরাজ ২০২২: ৪৪)

অর্থাৎ, বুদ্ধিমান ব্যক্তি রোগ-দুর্ভিক্ষ পীড়িত দেশ, অপরাধমূলক জীবিকা, চরিত্রহীন পত্নী, অপকারী নদী, খারাপ জিনিস এবং পচা বা নষ্ট আহার্য বর্জন করবেন। কারণ যে দেশে প্রায়ই রোগ-বালাই, দুর্ভিক্ষ-মহামারী লেগে থাকে সে দেশে সুস্থভাবে জীবনযাপন করা কঠিন।

এ রকম দেশে মানুষ শারীরিক ও মানসিক অবনতির শিকার হয়। উন্নতির কোনো আশাই থাকে না। প্রত্যেকেরই জীবনে সুস্থভাবে জীবনযাপনের জন্য জীবিকার প্রয়োজন। তবে এই জীবিকার মাধ্যমে যেন কারো কোনো ক্ষতি বা অমঙ্গল না হয় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। এ ছাড়া মানুষের স্ত্রী যদি চরিত্রহীন হয়, তাহলে সংসারে অশান্তি লেগেই থাকে। ফলে মনে শান্তি না থাকলে কারো পক্ষে সুস্থ ও সুন্দর জীবন নির্বাহ করা সম্ভব হয় না। পচা বা নষ্ট খাদ্যদ্রব্য মানুষকে অসুস্থ করে তোলে। শরীরে রোগব্যাধি বাসা বাঁধে। এতে মানুষের মানসিক ক্ষতির পাশাপাশি আর্থিক ক্ষতিসাধন হয়। জীবনে উন্নতির আশা মানুষ হারিয়ে ফেলে। শুষ্ক বা জলহীন নদীও মানুষের জীবনে দুঃখ বয়ে আনে। কারণ জল ব্যতীত মানুষ বাঁচতে পারে না। তাই বেঁচে থাকতে হলে জলপূর্ণ নদীর প্রয়োজন। সর্বোপরি সুস্থ জীবনযাপনের জন্য মানুষকে খারাপ বিষয় ত্যাগ করতে হবে। তাই চাণক্য এসব বিষয় পরিত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর আদর্শ মানবজীবন গঠন করতেও এর অনুসরণ অপরিহার্য। মানুষের জীবনে ধর্ম, অর্থ এবং সুখ ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত। ঈশ্বর-সৃষ্ট পৃথিবী কখনো অপবিত্র হয় না। পৃথিবী সবকিছু ধরে রেখেছে বলেই কোনো কিছুই তাকে অপবিত্র করতে পারে না। পৃথিবীতে সজ্জনেরা হিংসা-দ্বেষ বর্জন করে চলেন। মূলত ধর্মকে সঙ্গে নিয়ে তথা সৎভাবে জীবন পরিচালিত হলে বিশ্বে অর্থ, সুখ সবই পাওয়া সম্ভব। তাই চাণক্য ধর্মকে অর্থ এবং সুখ, অর্থাৎ জগতের সবকিছুর সারবস্তু বলে উল্লেখ করেছেন:

> ধর্মার্থে প্রভবতি ধর্মাৎ প্রভবতি সুখম্।
> ধর্মেণ লভ্যতে সর্বং ধর্মসারমিদং জগৎ॥ (পৃথ্বীরাজ ২০২২: ২১৭)

বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান উন্নতির ফলে দেশ ও সমাজব্যবস্থার যতই পরিবর্তন হোক না কেন, একটি সুস্থ, সুন্দর ও সুশৃঙ্খল সমাজব্যবস্থার জন্য প্রয়োজন আদর্শ মানবসন্তান। আর চাণক্য নির্দেশিত উপরের নীতিবাক্যগুলো আদর্শ মানবচরিত্র গঠনে কার্যকরী অবদান রাখবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। চাণক্যের নীতিবাক্যের মধ্যে রয়েছে মানবজীবনের বহুমুখী শিক্ষা এবং ব্যক্তিজীবনকে পরিচালিত করার ব্যবহারিক জ্ঞান—যে জ্ঞানের ব্যাপ্তি প্রতিটি মানুষের জীবনে আলোর দ্যুতি ছড়িয়ে মূল লক্ষ্যে পৌঁছাতে সহায়তা করে।

নৈতিকতা বিবর্জিত দেশ ও সমাজ কখনো উন্নতি করতে পারে না। যুগ যুগ ধরে এসব নীতিবাক্য অতীতে ছিল, বর্তমানেও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। তাই আদর্শ মানবচরিত্র গঠনে চাণক্যের নীতিকথা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, অর্থবহ ও তাৎপর্যপূর্ণ।

সহায়কপঞ্জি

টি গণপতি শাস্ত্রী (১৯১২)। *কামন্দক প্রণীত নীতিসার* (সম্পাদিত), কেরালা: ত্রিবেন্দুরাম গভর্নমেন্ট প্রেস

পৃথ্বীরাজ সেন (২০২২)। *চাণক্য প্রণীত চাণক্য শ্লোক ও নীতিকথা সমগ্র* (সংকলন ও সম্পাদনা)। কলকাতা: মাইতি বুক হাউস

মালবিকা বিশ্বাস ও ময়না তালুকদার (২০২৩)। *চাণক্য প্রণীত চাণক্য সার-সংগ্রহ* (পাঠোদ্ধার ও সম্পাদনা)। ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

মোস্তাক আহমাদ (২০১৩)। *মহাজ্ঞানী চাণক্যের শ্লোক ও জ্ঞানতত্ত্বের বিশ্লেষণ*। ঢাকা: সমাচার

Dasgupta, S N and De, S K (1947). *A History of Sanskrit Literature*: Classical period (Vol-1). Calcutta: University of Calcutta